মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র– শক্তিশালী আধুনিক গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যে আদর্শ, চেতনা ও অঙ্গীকার নিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তার সার্বিক চিত্র দেশের চলচ্চিত্রে আজও প্রতিফলিত হয়নি। অথচ এটা ছিল সময়ের দাবি, প্রাণের গভীর দাবি।

আমরা জানি, পৃথিবীর বহু দেশের চলচ্চিত্রেই মুক্তি আন্দোলনের ঘটনা গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং হচ্ছে। ওয়্যার এ্যান্ড পিস, ব্যালাড অব এ সোলজার, ক্রেনস আর ফ্লাইং, লিবারেশন, লিটল ফ্লাওয়ার তারই কিছু উল্লেখ্যযোগ্য নমুনা। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রে আজও এমন কোন আন্তর্জাতিকমানের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং প্রামাণ্য–এ তিন ধরনের চলচ্চিত্রই নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তা হাতেগোনা।

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ভারতে। কলকাতায় উমাপ্রসাদ মৈত্র বাংলায় বানান কাহিনীচিত্র। আর বোম্বেতে হিন্দিতে কাহিনীচিত্র বানান আইএস জোহর "জয় বাংলাদেশ" নামে। জোহরের ছবিতে অভিনয় করেন বাংলাদেশের নায়িকা কবরী। কিন্তু ছবিটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হওয়ার ফলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। ফলে ভারত সরকার "জয় বাংলাদেশ" চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করে। ১৯৭২-৭৩-এর মধ্যে মুক্তি পায় চারটি চলচ্চিত্র ঃ চাষী নজরুল ইসলামের–"ওরা ১১ জন", সুভাষ দত্তের– "অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী", মমতাজ আলীর– "রক্তাক্ত বাংলা" ও আনন্দের "বাঘা বাঙালী"। এর মধ্যে প্রথম দু'টি চলচ্চিত্রে কমবেশি মুক্তিযুদ্ধের ছাপ রয়েছে। বাকি দু'টি চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনার চেয়ে বাণিজ্যিক লক্ষ্যই বেশি কাজ করেছে বলে সমালোচকরা মন্তব্য করেন। এ হিসাবে বলা যায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র – "ওরা ১১ জন"। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত এ ছবিতে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহ চিত্রায়ন করা হয়। এ ছবির শুরুতে আছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস এবং স্বজন হারানোর বেদনা দৃশ্য। ছবিতে মানবিক বোধও আমরা দেখতে পাই। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবির মধ্যে এটি অন্যতম একথা বলা যায়। এরপর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিত নিয়ে ১৯৭৩ সালে নির্মিত হয় আলমগীর কবিরের– "ধীরে বহে মেঘনা", আলমগীর কুমকুমের "আমার জন্মভূমি", খান আতাউর রহমানের "আবার তোরা মানুষ হ"। ১৯৭৪ সালে নির্মিত হয় মিতার "আলোর মিছিল", চাষী নজরুল ইসলামের "সংগ্রাম", মোহাম্মদ আলীর "বাংলার ২৪ বছর" ও আনন্দের "কার হাসি কে হাসে"। ১৯৭৬ সালে নির্মিত হয়– হারুনুর রশিদের "মেঘের অনেক রং" ও শহিদুল হক খানের " কলমি লতা"। এরপর আর মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। পরবর্তীসময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে আলমগীর কবিরের "রূপালী সৈকত" (১৯৭৯), এজে মিন্টুর "বাঁধন হারা" (১৯৮১) এবং মতিন রহমানের "চিৎকার" (১৯৮২)। এরপর দীর্ঘ বিরতি। সেই বিরতির ধ্যান ভাঙ্গান কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি নির্মাণ করেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র "আগুনের পরশমনি" (১৯৯৫)। চলচ্চিত্রটি বোদ্ধামহলে শুধু নয়, সাধারণ দর্শক মহলেও দারুণভাবে নাড়া দেয়। যদিও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেই তিনি প্রকাশ করেছেন, যা দেখে মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটভূমিকে মোটেই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বলা যায়– অবরুদ্ধ ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধারা যে অপারেশন পরিচালনা করেন তারই চলচ্চিত্রায়ন "আগুনের পরশমনি"। মানবিক ভালবাসাও এ ছবির অন্যতম উপজীব্য। এরপর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে আবার এগিয়ে আসেন পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম। তিনি সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন "হাঙ্গর নদী গ্রেনেড" (১৯৯৭)। খান আতা নির্মাণ করেন "এখনও অনেক রাত" (১৯৯৭)। শামীম আখতার নির্মাণ করেন "ইতিহাস কন্যা" (১৯৯৯)। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের ওপর হাতেগোনা যে কয়জন চলচ্চিত্র নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তাঁরা কেউই সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যেতে পারেননি। পারেননি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে, যা আজও দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক!

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

যুদ্ধের শেষ দিকে জহির রায়হানের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এর দুটি তৈরি করেন আলমগীর কবির ও অপরটি বাবুল চৌধুরী। আর জহির রায়হান নিজে পরিচালনা করেন স্টপ জেনোসাইড ছবিটি। চলচ্চিত্রটি বিদেশের একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়। তবুও এই ছবিটিকে প্রামাণ্যচিত্রের দলে ফেলাই হবে উত্তম। তারপর আশির দশকে একদল তরুণ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বিষয় হিসাবে মুক্তিযুদ্ধকে বেছে নেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তার মধ্যে রয়েছে– মোরশেদুল ইসলামের "আগামী", তানভীর মোকাম্মেলের "হুলিয়া", মোস্তফা কামালের "প্রত্যাবর্তন", হাসিবুল ইসলাম হাবিবের "বখাটে", খান আখতার হোসেনের "দুরন্ত", দিলদার হোসেনের "একজন মুক্তিযোদ্ধা", আবু সায়ীদের "ধূসর যাত্রা", এনায়েত করিম বাবুলের –" পতাকা", সুমন আহমেদের 'নীল দংশন" এবং নাসির উদ্দিন ইউসুফের "একাত্তরের যীশু"।

মোরশেদুল ইসলামের "আগামী" চলচ্চিত্রটির মূল চেতনা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার পাশাপাশি রাজাকার আলবদরদের চিহ্নিত করা। ছবিটি ১৯৮৫ সালে দিল্লী চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য রৌপ্য পদক লাভ করেছে। মোস্তফা কামাল পরিচালিত "প্রত্যাবর্তন" ছবিতে স্বাধীনতাবিরোধীদের পুর্ণর্বাসনের বিষয়টি এসেছে তানভীর মোকাম্মেলের "হুলিয়া" ছবিতেও পাকিস্তানী দুঃশাসনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাসির উদ্দিন ইউসুফের "একাত্তরের যীশু"। শাহরিয়ার কবিরের গল্প থেকে নির্মিত এ ছবিতে খ্রিস্টান অধ্যুষিত বাংলাদেশের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে একাত্তরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, যিনি মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন, জীবন দেন, তিনিই যীশু।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও যেসব স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তাহলো– তানভীর মোকাম্মেলের "নদীর নাম মধুমতি", হারুনুর রশিদের "আমরা তোমাদের ভুলবো না", গোলাম ফারুক আহমদের "দংশন", মোরশেদুল ইসলামের "শরৎ একাত্তর"।

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ঋত্বিক ঘটক ও শুকদেব। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরও বেশকিছু প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ই এসব প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এর মধ্যে রয়েছে জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড'। 'এ স্টেট ইজ বর্ণ', আলমগীর কবিরের "লিবারেশন ফাইটার্স" এবং বাবুল চৌধুরীর 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস্'।

এক অসাধারণ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র "স্টপ জেনোসাইড"। বলা যায়, এ চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষভাবে যত চমৎকারভাবে মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত তা অন্য কোন চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়নি। এ চলচ্চিত্রে পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর নির্মমতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আলমগীর কবির পরিচালিত "লিবারেশন ফাইটার্স" চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত, যুদ্ধের প্রস্তুতি, কঠিন জীবন, প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে তারেক ও ক্যাথেরিন মাসুদ পরিচালিত "মুক্তির গান"। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিনের ধারণ করা ফুটেজ ব্যবহার করে "মুক্তির গান" ছবিটি নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন একদল নিবেদিতপ্রাণ সংস্কৃতিকর্মী বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা গঠন করে দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষকে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে মুক্ত এলাকা ও রণাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে বেড়িয়েছেন। তাদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডই মুক্তির গান ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে ক্যাথেরিন মাসুদ ও তারেক মাসুদের– "মুক্তির কথা"।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালী জাতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, তা রয়েছে অবহেলিত, উপেক্ষিত। যে মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন সত্তা পেয়েছি আজ তাকে উপেক্ষা করার অর্থ-আমাদের নিজস্ব সত্তাকে অস্বীকার করা। তাই নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের অঙ্গীকার হোক গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধকে অবহেলিত, উপেক্ষিত না করে তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের জীবনকে চলচ্চিত্রসহ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিফলিত করা।

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রাচ্যনাটের 'কইন্যা'

দৈহিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন আত্মিক শান্তি, যার অন্বেষণে ভিন্ন চিন্তায়, ভিন্ন ভাবধারায় এমনকি ভিন্ন নিয়মের শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করতে ভালবাসে মানুষ। পরম শক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মসম্মানের এই রীতিতে যেমন আছে কঠিন সংযম, তেমনি আছে ভাবের প্রগাঢ় ছায়ায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়া–ভাল লাগা এবং ভালবাসাই যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। হতে পারে তা গাছ-ফুল-পাতা, পশু-পাখির সঙ্গে, হতে পারে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে কিংবা শুধুই নিজের সাথে। মানসিক নির্ভরতাই যদি মুখ্য বিষয় হয় তবে নিজের ওপর আস্থা স্থাপনের জন্য নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যও এক মানুষ অপরকে করে পর্যুদস্ত কিংবা বানায় দেবতা। সেই দেবতা যদি সবকিছু ছাপিয়ে হয়ে ওঠে লোভী কিংবা আকৃষ্ট হয় ক্ষমতার প্রতি–সেখানেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। কঠিন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হয় মানুষ। আত্মিক অশান্তি তাকে ঠেলে দেয় পতনের মুখে। উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই প্রাচ্যনাটের নতুন প্রযোজনা 'কইন্যা'।

রচনা ঃ মুরাদ খান

নির্দেশনা ঃ আজাদ আবুল কালাম

নাট্যকার 'কলারুকা' জনপদের মানুষের সামাজিক জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন, যারা মনে করে 'কইন্যাপীর' তাদের দেখে রাখে। বিশ্বাস যেমন কোন নিয়মে পড়ে না, তেমনি চোখে দেখা যায় এমন কোন বিষয়কে অবলম্বন করে জীবন চালাতে মানুষ বেশি পছন্দ করে। সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসই সংস্কৃতি। নাট্যকার সেই সংস্কৃতির গোড়ায় হাত দিয়েছেন, যেখানে সাধারণ মানুষ, তাদের চিন্তাচেতনা খুবই স্পর্শকাতর। তিনি ভিন্ন চিন্তাভাবনার মানুষদের বিশ্বাসের চিত্র দিয়েছেন, কিন্তু সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন সেই চিত্রের লক্ষ্য কিংবা উদ্দেশ্যকে।

বড় ভাই নাইওর (আজাদ আবুল কালাম) জনপদের সবাই মনে করে তার ওপর কইন্যাপীরের ভর আছে। বিপত্নীক নাইওর নিজেকে খুঁজে ফেরে প্রকৃতি, পশু, পাখি, বিপরীত লিঙ্গের সাথে দৈহিক মিলন, এমনকি পুকুরে মাছরূপে বসবাসকৃত কইন্যাপীরের সাথী 'বহুরূপীর' (রাহুল আনন্দ) কাছে। ইশ্‌কে মাতোয়ারা নাইওর নিজেকে জানার দীক্ষা নেয় বহুরূপীর কাছে। তার অস্তিত্বজুড়ে রয়েছে ভাবের খেলা। তার আত্মিক ভাবধারার প্রতিফলনে মানুষ তাকে দেখে পীররূপে। বাড়িতে আশ্রিত মেছাব (তৌফিকুল ইসলাম ইমন), যার কাছে জীবন একটা প্রশ্ন, ধারা বদলাতে লাইন থেকে সরে এসেও নতি স্বীকার করে ক্ষমতার কাছে। নাইওরের ছোট ভাই দিলবরের সাথে মেছাব বিয়ের আয়োজন করে নিজ গ্রামের এক কইন্যার, যার প্রতি রয়েছে তার আসক্তি। যৌনতার ভিন্ন ভাবনায় বিশ্বাসী দিলবর (শতাব্দী ওয়াদুদ), যার কাছে নারী একটি ভিন্ন মাত্রা, একটি আতঙ্ক, যেহেতু কালারুকায় নারী পূর্ণতা পায় না। বিয়েতে সে রাজি হয় শুধু হরিরামপুরের মৌলভী সাহেবজাদার ওষুধের খবর শুনে।

কইন্যার (শাহানা রহমান সুমি) আগমন ঘটে কালারুকায়। ঘটনার নাটকীয়তার শুরু এখানেই। কইন্যার নিত্যদিনের সাথী ঝিঙ্গা ফুল, আকাশের মেঘ-বৃষ্টি। জলের মতো টলটলে, পাখির মতো উচ্ছল কইন্যার মঞ্চক্রিয়া, সংলাপ প্রক্ষেপণ, আত্মিক ও শারীরিক অভিনয়ে আবিষ্ট হয় দর্শক। তার সরলতায় আকৃষ্ট হয় এমনকি পীর সাহেব নাইওর নিজেও। নাইওরসহ তোতার (সাখাওয়াত হোসেন রেজভী) গায়েন মনের প্রভাব পড়ে কইন্যার ওপর। আত্মিক নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে কইন্যাও নিজের ভাল লাগা প্রকাশ করে মাছবেশী বহুরূপীর কাছে। বহুরূপী রূপ বদলায়। পুকুরের ধোয়া-আলো, শ্যাওলা আর জলের প্রগাঢ় টানে কইন্যা ধরতে পারে না সেই রূপ কার? গর্ভবতী হয় সে।

নির্দেশক তাঁর দৃশ্যায়নে মানুষকে তুলে এনেছেন মায়ার জগতে। সেখানে বাস্তব মানুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর আত্মিক অবস্থান। সেখানে মাছ, গাছ, পাখি এমনকি পুকুরের পানিও সেই আত্মিক ভাবধারায় ফুটে ওঠে নিজ নিজ অবস্থান থেকে। মনের ভিতর থেকে কল্পনায় এমনকি আকাশের মেঘ-বৃষ্টিও নাটকীয় মুহূর্তের দৃশ্য রচনা করে।

হরিরামপুরের মৌলভী সাহেবজাদার ধর্মচিন্তা নাইওরের ধর্মচিন্তা থেকে আলাদা। মুর্শিদী চিন্তাধারায় সে চায় কালারুকায় তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। নাটক তার নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠা করে তখন, যখন সাহেবদাজা তার কার্য হাসিল করতে মেছাবকে ব্যবহার করতে শুরু করে। নির্দেশক যেন ভাবের দৃশ্য থেকে হঠাৎই নেমে এসেছেন বাস্তব দৃশ্যে। দ্বন্দ্বের জন্য প্রয়োজন সামান্য কারণ–বাস্তব জীবনে তার যেমন কমতি নেই, তেমনি দ্বন্দ্ব এড়াতে আত্মার শান্তি প্রত্যাশী নাইওর নিজেকে বিলীন করে চায় আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটাতে।

বাস্তব এবং ভাবনার সংমিশ্রণে দৃশ্যকল্প তৈরিতে মোঃ সাইফুল ইসলামের আলো এবং রাহুল আনন্দের সঙ্গীতের সঙ্গে চরিত্রসমূহের শারীরিক অভিনয় প্রয়োগরীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মঞ্চক্রিয়া এবং মঞ্চদ্রব্যাদির ব্যবহারে নির্দেশক ছন্দায়িত যে রূপ ব্যবহার করেছেন তাতে সহজেই আবিষ্ট হয়েছে দর্শক। প্রতিটি চরিত্রের আত্মিক-চারিত্রিক কাঠামোর সঙ্গে বাস্তব চরিত্রের যোগাযোগ এবং একই সঙ্গে দর্শককে আবিষ্ট করেছেন মায়ায়। সে মায়া তৈরি হয়েছে সম্মিলিত মঞ্চক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যদিও প্রায় সমস্ত চরিত্রের সংলাপ প্রক্ষেপণে বীররসের প্রভাব সমগ্র উপস্থাপনার ঢং থেকে ছিল আলাদা।

কইন্যার মূল উপজীব্য হতে পারে অহিংস নীতি, হতে পারে মারফতী কিংবা মুর্শিদী দ্বন্দ্ব, হতে পারে শুধুই প্রেম। যাই হোক না কেন, মানুষ তার ক্ষুদ্র জীবনের প্রভাব থেকে বের হয়ে আসে না। এর মাঝেও সাহেবজাদা খোঁজে ক্ষমতা, মেছাব খোঁজে প্রভাব, নাইওর খোঁজে আত্মার শান্তি, কইন্যা খোঁজে তার অনাগত সন্তানের জন্য অন্যরকম ভবিষ্যত।

মাহবুব পারভেজ